International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 22-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সাহিত্যে 'পরিবহন' : বাংলা ও বাঙালি

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The 'Human Civilization' was started from the use and invention of fire and wheels. Gradually, throughout the century, the various formation and reformation of wheels have made the necessity of making car and other transport. Transport is the mandatory need to our modern life. Nowadays, various types of carriages are developing our transport system in many ways. All around the world, the technology of making smooth and finest vehicles is still going on and those are being modifyingly changing our behavioral pattern too. In Bengali literature, the use and art of transport related to character and culture have also flourished from the earlier decades. From Chayapada, Srikrishnakirtan, Vaishnab Padabali to modern Bengali novel and short-stories, this trend and tradition of bengalee's transport are being scripted. The value of vehicles like dingi (dinga), nouka, pansi, bajra, palki, train, rickshaw, bi-cycle etc. are being earnestly admitted in our Bengali literature. So far, the cultural heritage of vehicles is still being visualized by bengalee society which was started from eighteenth century in Bengal. In my article, I tried to analyse the evolutionary change of vehicles as well as transport in term literary permutation from earlier Bengal as well as Bengalee Society till now.

Key Words: Human Civilization, Invention and use of Wheel, Transport, Vehicles, Bengali Literature, Bengali Culture, Bengalee Society.

বাঙালি জীবনে পরিবহনের ধারা ও তার প্রভাব নিয়ে খুব বেশি আলোচনা কিংবা গবেষণা হয়নি। কিন্তু বাঙালির এই পরিবহন-সংস্কৃতি বহুকাল থেকেই বঙ্গসংস্কৃতির এক অনিবার্য অঙ্গ। মানুষের জীবনে পরিবহন ও পরিবাহকের প্রয়োজন নতুন কথা নয়। যবে থেকে মানুষ চাকার আবিস্কার ও তার ব্যবহার করতে শুরু করেছে তবে থেকেই মানুষের জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব দরজা খুলে গেছে। যন্ত্রের আগুন ও চাকার আবিস্কারই হয়তো আজকের মানবসভ্যতার দ্রুত পটপরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ফল। চাকার আবিস্কার আধুনিক সভ্যতার পথ ধরে আপামর মানুষের জীবনে সব থেকে যে বড় রূপান্তরটি এনে দিয়েছে তার মূলে অবশ্যই আছে পরিবহন। পরিবহনের মূলে আছে 'যান' শব্দটি। আবার 'যান' শব্দটিও এসেছে 'যন্ত্র' থেকে। আজকের মানুষ নিজে থেকে না যতখানি যন্ত্রের দাস হয়েছে তার থেকে বাস্তবে ও কল্পনায় যন্ত্রকে তার দাসত্বে এনেছে অনেক বেশী। তবে যন্ত্রের প্রতীক 'যান' বাঙালির কাছে যতটা না দাসত্বের তার থেকে অনেক বেশী আবেগের। যানের উন্নত থেকে উন্নততর রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ পৌঁছে যাচ্ছে আরো দ্রুত থেকে দ্রুততর মাধ্যমে আর সেই

মানুষেরই একটি অংশ অর্থাৎ বাঙালিরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে বিশ্বের দিকে আর আবেগে ভাসছে। কেন এমন হচ্ছে? এর একটাই উত্তর এবং তা হলো যানের সঙ্গে বাঙালীর জীবনের সম্পর্ক বড়ো নিবিড়। বৃহত্তর অর্থে জগৎজোড়া প্রায় সবরকম এবং সব শ্রেণীর, অর্থাৎ স্থল, জল ও আকাশযানের সঙ্গেই আজকের বাঙালী জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোত ভাবে। আর বাংলার বুকে এই সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ও জীবন-ঘনিষ্ট যে বাঙ্গালীর নিত্যদিনের জীবনে তা এক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এই সংস্কৃতি বাঙ্গালির আড্ডা কিম্বা পিঠে-পুলি সংস্কৃতি থেকে কোনো অংশে কিছু কম নয়। তাই বলা যায়, কেবল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি কিম্বা সভ্যতাই নয়, অতীত থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দির হালের দশক পর্যন্ত বাঙ্গালি জীবনের অন্যতম অঙ্গ হলো তার এ যান-সংস্কৃতি। বাঙালি জীবনে ছেয়ে যাওয়া তার সুবিস্তৃত ডানার একদিক স্পর্শ করে আছে সভ্যতা আর অন্য দিক ছুঁয়ে আছে সমাজ। মধ্যিখানে অবশ্যই আছে সাহিত্য। বিশ্ব অথবা দেশীয় তথা ভারতীয় অন্যান্য সংস্কৃতির কথা যদি বাদও দিই, শুধুমাত্র বাঙালির যান-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই সেকাল থেকে একালে লেখা হয়েছে কত আখ্যায়িকা, কাহিনী, কিংবদন্তি, উপন্যাস, গল্প, নাটক, গান অথবা কবিতা! প্রাচীন ভেলা অথবা বাণিজ্যতরী থেকে শুরু করে বাঙালির জীবন ও জীবিকার যে চিরায়ত অনুসন্ধান একদিন শুরু হয়েছিল যানকে কেন্দ্র করে, আজকের মোটর গাড়ীর সর্বশেষ মডেলটির যুগে এসেও তা শেষ হয়নি। নৌকা, পালকি, বজরা, গরুর গাড়ী, এক্কা, কেরানচি, ফিটন, ঘোড়ায় টানা ট্রাম, রেলগাড়ী, ট্রাম কি নেই বাঙালির জীবনে, সাহিত্যে, সমাজে! চর্যাপদ (বৌদ্ধদের লেখা হলেও তা প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা বাঙালিরই সাহিত্য) থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যের যুগ ছাড়িয়ে আধুনিক কালে এসে তা মিশে গেছে 'হুতোমের নকশা'-য় কিম্বা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'-য়। অদ্বৈতের 'তিতাস একটি নদীর নাম', তারাশংকরের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মত উপন্যাসে তা বিস্তৃত হয়ে আছে অসংখ্য সৃষ্টি ও সত্তায়।

বাঙালি জীবনে পরিবহন অথবা যানের অভিযান শুরু হয়েছিল লোকযান দিয়ে। প্রাচীনতম কালে গাছের গুঁড়ি, নলখাগড়া, বাঁশ বা কলাগাছের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরী হতো। একে বলা হত 'মান্দাস' বা 'মাঞ্জুস'। আবার কখনও কখনও গাছের মোটা গুঁড়ি কেটে তা থেকে তক্তা বানিয়ে গজাল দিয়ে তার ভেতরের অংশ কুঁদে (drag out) করে নৌকা বানানো হতো। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে জানা যায়, ঐ একই যান 'বালাম' নামে পরিচিত ছিল। আজও বন্যার সময় গ্রামে বা শহরে বাঁশের বা কলার ভেলা পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। হিন্দু তথা বাঙালিরা সাপে কাটা মৃত ব্যক্তিকে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয়, বাঁশের মাচায় শুইয়ে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানঘাটে দাহকার্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। একক বা সমবেত লোকগানের মধ্যেও লোকযান প্রসঙ্গ এসেছে। ছই দেওয়া নৌকো ভাঁটির টানে ভেসে গেছে বাঙালি জীবনের কত খণ্ড-খণ্ড আনন্দ-হর্ষ অথবা বিরহ-বেদনার পসরা নিয়ে। রামায়ণে উল্লেখ আছে সেকালে কৈবর্তরা নৌকা বাহনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' অবলম্বনে সুকুমার সেন বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নৌকাচালনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেও আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলার সমাজচিত্রের কথাই ফুটে উঠেছে। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তো বটেই এমনকি শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'নৌকাখণ্ড' পড়লেই বোঝা যায় তৎকালীন বাঙালী সংস্কৃতিতে নৌকার প্রভাব কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চর্যার সমাজচিত্রে আছে নৌকা আর কেড়ুয়ালের কথা। চর্যায় কমপক্ষে ছয়-জায়গায় আধ্যাত্মিক ভাবে ভবনদীর প্রসঙ্গ এসেছে। এই ভবনদীর কাণ্ডারী হলো নৌকা। সুতরাং চর্যার আধ্যাত্মিক সত্তা তথা সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে নৌকা। লোকসমাজে একসময় পাল্কি ছিল এক অপরিহার্য যান। পালকি ছিল বিয়ের বর-কণের বাহনও। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান' কিম্বা 'দূরের পাল্লা' কবিতাগুলি পড়লে পালকির সঙ্গে বাংলার গণসংযোগ এককালে কতখানি ছিল তা আজও বেশ আন্দাজ করা যায়! একসময় বাংলার কাহাররা ছিল পালকির বাহক। এদের জীবনকাহিনী নিয়েই লেখা তারাশংকরের উপন্যাস 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' কিম্বা 'মুসলমানীর গল্প' গল্পেতে আছে নৌকা অথবা পালকির কথা। ১৮২৭ সালে বাংলায় প্রথম যান ধর্মঘট করে পাল্কি বাহকেরা। পালকি ও বজরার প্রসঙ্গ আছে বঙ্কিমের 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী'-র মতো উপন্যাসে। একসময় গ্রামবাংলার বুকে ভিস্তি, ভড়, কোশা, ছণ্ডি, ডোঙা, কটি প্রভৃতি নৌকার চলাচল ছিল।

এপার বাংলায় বিশেষতঃ ওপার বাংলায় আজও তার কিছু কিছু প্রচলিত। হরিশংকর জলদাসের 'দহনকাল' উপন্যাসে নৌকা, জাল, মাছ ধরা সহ বাংলার ধীবর সম্প্রদায়ের কথা আছে। ঈশ্বর গুপ্তের লেখা 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' গ্রন্থটি থেকেও সেকালের যান বিষয়ক নানা তথ্যের সন্ধান মেলে।। সেকালে 'তাঞ্জাম' ছিল বড়লোকের পালকির নাম। এতে নবাব বাদশাহরা বসতেন। পরবর্তীতে ইংরেজ সাহেব তথা জজ্-ম্যাজিস্ট্রেটরাও এতে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় মেয়েরা এতটাই পর্দানশীন ছিলেন যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যখন গঙ্গাস্নানে যেতেন তখন তাদের পালকিসুদ্ধ জলে ডুবিয়ে স্নান করিয়ে আনা হতো। আজও গঙ্গাস্নান পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত হিন্দু বাঙালি সমাজে। কিন্তু আজ আর বাঙালিরা পাল্কী ব্যবহার করে না। অথচ একসময় 'গঙ্গাস্নান' নামক পুণ্যকর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল নৌকা, বজরা ও পালকির নাম। অক্ষয় কুমার দত্তের 'প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌযাত্রা' (১৯০১) শীর্ষক গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলার বাঙালিদের নৌ-যাত্রার প্রসঙ্গ আছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসওদাগরের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় বাঙালির বৈদেশিক বাণিজ্য কত প্রাচীন! বঙ্গদেশের বণিকেরা একসময় পর্তুগাল ও স্পেনে বড় মালবাহী নৌকায় মসলা ও মসলিন সহ নানাজাতীয় পণ্য রপ্তানি করতেন। শুধু তাই নয়, এককালে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ এমনকি পূর্ববঙ্গের বৃহৎ অঞ্চলে নৌকার বাইচ্ খেলা হতো। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এই বাইচ্ খেলার সংস্কৃতিও বহু পুরোনো। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার চলচ্চিত্রায়িত রূপে বাইচ্ খেলার প্রসঙ্গ আছে। এই বাইচ্ খেলায় সাধারণতঃ সরু ও লম্বা (তাই দ্রুত গতিসম্পন্ন) ছিপ নৌকো ব্যবহৃত হয়। এতে একটি নৌকায় অনেকগুলি দাঁড়ি থাকে। ছিপ নৌকা, ভড় নৌকা এবং জেলে নৌকা এখনও বাঙালি জীবন, জীবিকা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে। এখনও বাংলার গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু মানুষ ডিঙি নৌকা তৈরি করে জীবন ধারন করেন। বঙ্গ সংস্কৃতিতে মকরমুখী, সিংহমুখী, হংসমুখী অথবা ময়ুরপঙ্খী প্রভৃতি অসংখ্য জলযানের কথা জানা যায় যেগুলি একসময় অবস্থাপন্ন বাঙালির জলযান রূপেই পরিগণিত হতো। সেকালে শুভক্ষণ ও শুভতিথি দেখে যথাবিধিপূর্বক পূজো করে তারপর নৌকায় চাপা হতো। এছাড়াও পূর্ববঙ্গে নৌকার গান রূপে প্রচলিত ছিল সারিগান। দুর্গাপূজার সময় খোল-করতাল সহ পদ্মাবক্ষে নৌকার ভিতর আসর বসতো দোহার গানের। ভাওয়াইয়া (উত্তরবঙ্গ) গানের সঙ্গে যেমন যোগ আছে গোরুর গাড়ি কিম্বা মোষের গাড়ির চালকের ঠিক তেমনই ভাটিয়ালি গান বাংলার সংস্কৃতিতে মিশে আছে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের আশ্রয় করেই। এমনই এক ভাটিয়ালি গান হলো-'ওরে সুজন নাইয়া- / কোন্ বা দেশে যাওরে তুমি, সোনার তরী বাইয়া / কোন্ বা দেশে বাড়ি তোমার, কোন্ বা দেশে যাও / এই ঘাটে লাগাইয়া নাও আমায় লইয়া যাও।' কৃষ্ণপ্রেম থেকে শুরু করে গৌরাঙ্গপ্রেম বা তার অধ্যাত্মতত্ত্বও উঠে এসেছে বাংলার ভাটিয়ালি গানে। এছাড়াও শাক্তগীতি, চর্যাগীতি, সুফী, বাউল, মুর্শিদ্যা, মারিফতির মধ্যেও কোথায় যেন প্রাণের যোগ আছে নদীমাতৃক বাংলা আর নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকার। এমনকি সত্তরের দশকেও পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতাকে অবলম্বন করে যত গান ও গল্প লেখা হয়েছে তার বেশীরভাগের মধ্যেই মিশে আছে নদী আর নৌকা। মানিকের 'পদ্মা নদীর মাঝি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' কিম্বা অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' নদীমাতৃক অন্ত্যজ বাঙালির জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই লেখা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা আন্দোলনের উপর লেখা গল্প 'নতুন গান' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দীনবন্ধু মিত্রের জীবন অবলম্বনে লেখা 'একটি অমর রাত্রি' গল্পের ঘটনাগুলিও নৌকার উপর থেকে দেখা বাংলার জীবন ও ইতিহাসের বর্ণময় উপলব্ধির আলোয় জীবন-সত্য খুঁজে ফেরার গল্প।

আধুনিক কবিতার আধারেও উঠে এসেছে বাঙালীর জীবনচর্যার নানা অনুভব পরিবহনকারী যানের অনুষঙ্গে। উৎপল কুমার বসু, নবনীতা দেবসেন, ভাস্কর চক্রবর্তী, রণজিৎ দাশ, জয় গোস্বামী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ বারে বারে এসেছে। জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রি' কবিতায় কলকাতার রাত্রিকালীন পরিবেশে মোটর কার-এর কথা এসেছে। এই মোটর কার-এর কথা জীবনানন্দের কবিতায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম কবির 'উনিশশো চৌত্রিশের' কবিতাটি (কৃত্তিবাস, আষাঢ়,

১৩৮০)। মোটরকারের মতোই তীব্রগতিতে কবিমনের ভাবনাগুলি এখানে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর 'রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে' (প্রকাশকালঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) কবিতায় আছে জাহাজের অনুষঙ্গ যা আমাদের মনের অনুভূতির দরজায় কড়া নাড়ে। কবি বলেনঃ

সাগরের দূরগামী জাহাজের মতো
কী করে কখন
অতি দূর থেকে ভেসে আসে----- জীবন ভাসমান
জাহাজের মতো। ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে।

এছাড়া তাঁর 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে' (উত্তরসূরি, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮), 'জীবনের মানে ভালো'(কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬৩) কবিতাগুলিতে যানের অনুষঙ্গ সবসময়ই এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯০৩ সনে রাইট ভাতৃদ্বয়রা আবিস্কার করলেন এরোপ্লেন। বাঙালিও এই প্রথম উড়ান যাত্রার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। ডাচ্ এয়ারলাইন্সের বিমানে চেপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিয়েছিলেন পারস্য ও ইউরোপ। এ শুধু বিশ্বকবির বিশ্বভ্রমণ ছিলনা, তা ছিল প্রাচ্য তথা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির এক মহামিলন। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে উড়ান নিয়ে কোনো কবিতা না লিখলেও আধুনিক কবিরা লিখেছেন। অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'রাত্রির প্লেন', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'চুয়াল্লিশ পাউন্ড', সুনির্মল বসুর লেখা 'অসম্ভব দুনিয়া' কবিতায় আকাশযানকে অনুষঙ্গ করে কবি-মনের ভাবনা ফুটে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নানা কবিতায় বাঙালির জীবন ও মন বিশ্লেষিত হয় কখনও রেলগাড়ি, কখনও ময়ূরপঙ্খী নৌকোর অনুষঙ্গে, আবার কখনও তাঁদের কারো কবিতায় শীতের কনকনে ঠান্ডায় উঠে আসে কোনো এক বিবর্ণ রিকশাওয়ালা বৃহত্তর জীবনেরই ব্যাখ্যায়। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৯৭৬) পড়লে মনে হয় ট্রেন সেখানে এক পৃথক ব্যঞ্জনা নিয়ে উঠে এসেছে। কবিতা সিংহের 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থের 'একা' কবিতাটি পড়লে মনে হয় জীবনটা যেন এক চলমান ট্রেন। কৈশোর, যৌবন তার একেকটি স্টেশন।

মধ্যবিত্ত তথা নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনে আর একটি সুপ্রচলিত যান হলো বাই-সাইকেল বা সাইকেল এবং রিক্সা। সুদূর বঙ্গসংস্কৃতির সাথে মিশে আছে সাইকেল নামক যানটি। ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম চীনে সাইকেল বিপ্লব শুরু হয়। গ্রামবাংলার সাইকেল সংস্কৃতিও বেশ পুরোনো। সাইকেলে বাঙালির বিশ্বভ্রমণ নিয়ে বিমল মুখার্জীর লেখা 'দুচাকায় দুনিয়া' (১৯৩৭) এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। একসময় রামনাথ বিশ্বাস সাইকেল চালানো নিয়ে লিখেছিলেন তাঁর গ্রন্থ 'সাইকেলে ভ্রমণ'। ঐ একই বিষয় নিয়ে বিমল দে লেখেন 'সুদূরের পিয়াসী' (১৯২৬)। একসময় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, ড.নীলররতন সরকার, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীরও প্রিয় যান ছিল সাইকেল। 'রিক্সা' শব্দটি জাপানী শব্দ হলেও 'রিক্সা' বস্তুটি গ্রাম, মফস্বল এবং শহরেও বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গেছে। তবে একালে কলকাতা শহরে হাতে টানা রিক্সার সংখ্যা বেশী হলেও প্যাডেল দেওয়া রিক্সার সংখ্যা খুবই কম। তবুও বলা যায়, বাঙালির কাছে ষাট এবং সত্তরের দশক থেকে আজ অবধি রিক্সার কদর যথেষ্ট। ইদানিং মোটর চালিত অটো-রিক্সা বা টোটো-রিক্সার আগমন ঘটলেও বাঙালির কাছে আজও প্যাডেল দেওয়া রিক্সায় চাপার মজাই আলাদা। গ্রামের যে কোনো পঞ্চায়েত, কাছারি কিম্বা স্কুল-কলেজে গেলে এখনও সার সার সাইকেল সজ্জা দেখা যায়। ইদানিং সে জায়গায় এসেছে মোটর সাইকেল। একসময় ডাক-হরকরা থেকে দারোগা পর্যন্ত গ্রামে সবাই যাতায়াত করতো সাইকেলে। এখনও কোনো কোনো গ্রামে সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে-গঞ্জে রিক্সা অথবা ভ্যান-রিক্সাও বাঙালির নিত্যদিনের সঙ্গী। সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের সংস্কৃতিও বাংলা তথা বাঙালির। রিক্সা ও সাইকেল Eco-Friendly তাই দূষণহীন এই সমস্ত যানবাহন বাঙালীর জীবনধারাকে আরো বেশী জনপ্রিয়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এবারে কলকাতা শহরের পরিবহন অথবা যানের ইতিবৃত্ত নিয়ে কিছু প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। ষাটের দশকে লেখা বিনয় ঘোষের 'টাউন কলকাতার কড়চা'(১৯৬১) এবং 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে সেই সময়কার কলকাতা শহরের যান সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। কলকাতা শহরে ব্রিটিশ আমলে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতো। বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম অনেক পরে এসেছে। ১৯০২ সাল থেকে কলকাতায় বিদ্যুতচালিত ট্রাম চলাচল শুরু হয়। কবিয়াল ধীরাজের গানে জানা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগী গাড়ি উল্টে আঘাত পাওয়ার কথা। সাহেবদের পালকি চাপার পাশাপাশি বাঙালিদের পাল্কি চড়া নিয়েও নানা গল্প প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে হিকি অগ্রগণ্য। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় কেরানচি গাড়ি ও ছ্যাকড়া গাড়ির কথা জানা যায় যা সেকালে কৃতবিদ্য বাঙালির তথা বঙ্গসংস্কৃতিতে অতি প্রিয় এক পরিবহন ছিল। একসময় ঘোড়ায় টানা ওয়েলার গাড়ি শহরের অন্যতম যানবাহন ছিল। ভিনটেজ কার হিসাবে পুরনো ফোর্ড গাড়ি এবং হুড খোলা ঘোড়ার গাড়িও বাঙালিদের খুব প্রিয় ছিল। রুরকীতে প্রথম মোটরগাড়ির কারখানা চালু হয়। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' থেকে বাঙালি ট্রেন বা রেলগাড়িকে অপুর মতোই এক নতুন দৃষ্টি আর আবেগ দিয়ে অনুভব করতে শিখলো। সুকুমার সেন বাঙালির রেলযাত্রার বিবরণ নিয়ে লিখেছিলেন 'রেলের পাঁচালি'। আবার দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা খুশবন্ত সিং এর Train to Pakistan-এ সেই আবেগই ফিরে এসেছিল অন্যভাবে। তা তুলে ধরেছিল ছিন্ন শিকড়ের কথকতা আর উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণাকে। একইভাবে অমিতাভ ঘোষের Hungry Tides-(অনুবাদঃ মাটির দেশ) কিম্বা Tony Judt-এর The Glory of the Rails-ও বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতিকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। বলাইবাহুল্য, ইংরেজ আমলের গাদা বোট (গদু বোট) অথবা বার্জ নৌকা এখন আর নেই। বাইচ্ নৌকাও আজ প্রায় অবলুপ্ত। ট্রাম ধীর যান, তাই তাও আজ হেরিটেজ যান হিসাবেই প্রচলিত মাঝেমাঝে যার অবলুপ্তির কথাও বলা হয়। মাছ ধরার জেলে নৌকা বা জঙ্গবোটের বদলে মাছ ধরার কাজে এখন এসেছে ট্রলার।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে ঝড়ে বেসামাল নৌকার আরোহী বাবুরামবাবুর মনে হয়েছে এই বিপর্যয় তাঁর দুষ্কর্মজনিত। অদ্ভুতভাবে প্যারীচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত উচ্চবিত্ত বাবু-কালচারকে তাঁর এ উপন্যাসে মিশিয়ে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় আছে বাবুদিগের নৌকাযাত্রা ও গণিকা বিলাসের বিবরণ। 'মাহেশের স্নানযাত্রা' উপলক্ষে একসময় বড় বড় পিনেস (পানসি), কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে বাবুরা মাহেশে যেতেন। সঙ্গে চলতো মাতলামো, রঙ-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি। 'দেবী চৌধুরাণী' ছাড়াও বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে আছে সেকালের প্রাত্যহিক বাঙালি জীবন তথা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে নৌকা, পানসি, ভড়, ছিপ আর বজরার কথা। কথিত আছে বাংলা 'ব্যাজার' শব্দটি থেকেই নাকি 'বজরা' শব্দটি এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেও কাহিনী ও চরিত্রের অভিমুখ পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নৌকা। রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাস্টার', 'অতিথি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায় বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সাথে কিভাবে জড়িয়েছিল পদ্মা-প্রকৃতি ও তার বুকে ভেসে চলা নৌকা, বজরা প্রভৃতি। নদীর একূল গড়া আর ওকূল ভাঙার ছন্দে গ্রথিত ভাব জীবনেরই স্রোতে ভেসে চলা যেন তা বাঙালির জীবন-সংস্কৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের নৈশ অভিযানের মধ্যে দিয়ে জানা যায় তখনকার গঙ্গার বুকে জেলে ও ডিঙি-নৌকার কথা। মানিকের 'পদ্মা নদীর মাঝি'-তেও আছে কুবের-কপিলার জীবনাশ্রয়ে পূর্ববাংলার মাঝি-মাল্লাদের জীবন-কথা। সত্তরের দশকের কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস কিম্বা 'পার' গল্পেও পাই জলযানের অনুষঙ্গে অন্ত্যজ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির ছবি। আরোও পরে অভিজিৎ সেনের 'মৌসুমী সমুদ্রের উপকূল' অথবা সাত্যকী হালদারের 'ইছাই নদীর পালা' প্রভৃতি উপন্যাসেও এসেছে জলযানের অনুষঙ্গে বাঙালি জীবনের নানা আচার, বিচার, প্রথা ও পালা-পার্বনের কথা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'সমুদ্র মানুষ' কিম্বা 'অলৌকিক জলযান' এমন উপন্যাস যা বাংলা তথা বাঙালির কথাসাহিত্যের ভূগোলকে আরও বিস্তৃত ক্যানভাসে তুলে ধরেছে। এছাড়াও অতুল চন্দ্র গুপ্তের

'নদীপথে', অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'পথে-বিপথে' এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর 'জলে-ডাঙায়' বাঙালির জলযান ভ্রমণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবন সংস্কৃতির এক বিস্তৃত পরিচয় দেয়। বিমল করের 'খড়কুটো' বহির্বঙ্গের (হাজারিবাগের) পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। এ উপন্যাসে টাঙ্গার কথা আছে। শরদিন্দুর 'পথের কাঁটা'-র মতো গোয়েন্দা গল্পে সাইকেল থেকে কৌশলে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে হত্যার কাহিনী রয়েছে। হাল আমলে লেখা প্রবীর চক্রবর্তীর 'সূর্য ওঠে', প্রচেত গুপ্তের 'ফিসফিস' (ট্রাম নির্ভর গল্প), প্রীতম বিশ্বাসের 'স্বপ্নের থাক্' (২রা আগস্ট, ২০১৬), অভিজিৎ সেনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (লঞ্চ নির্ভর গল্প), স্ফিংক্স (রিক্সা এবং ঠেলাগাড়ি অবলম্বনে লেখা গল্প), প্রতিভা বসুর 'প্রথম সিঁড়ি' (ঘোড়ার গাড়ি নির্ভর গল্প), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরী তলার উপকথা', শিবরাম চক্রবর্তীর হাস্যরসাত্মক গল্প 'বাসের মধ্যে আবাস', 'রিক্সায় কোনো রিক্স নেই', রণজিৎ দাসের 'সমুদ্র সংলাপ', অশোক সেনের 'গহীন' প্রভৃতি বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি নির্ভর গল্প। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' (১৯৪৬), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বলাকার মন'(১৯৭৫) কিম্বা বিভূতি (অভ্র) রায়ের 'হৃদয়ের শব্দ' উপন্যাসগুলি বাঙালির মনে উড়ানের আনন্দ এনে দিল। এছাড়াও কল্পবিজ্ঞানে হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘনাদা), সত্যজিৎ রায় (প্রফেসর শঙ্কু) ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (আকাশ দস্যু) যেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মহাকাশ যানে চাপিয়ে বাঙালিকে পৌঁছে দিলেন কল্পনাময় সুদূর ভিনগ্রহে। বাঙালির স্বপ্ন, সাধ অথবা সাধ্যের বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, মহাকাশ যানে চড়ার এ বাসনা বাঙালির আজন্মলালিত জীবন-সংস্কৃতিরই অঙ্গস্বরূপ।

বাংলা ছায়াছবিতে যানের মোটিফ নানাভাবে এসেছে। বলরাজ সাহনী অভিনীত হিন্দী 'দো বিঘা জমিন' চলচ্চিত্রে হাতে টানা রিক্সার মোটিফে ট্রাজিক জীবন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ অনবদ্য। সুবোধ ঘোষের লেখা 'অযান্ত্রিক' গল্পটি অবলম্বনে 'অযান্ত্রিক' সিনেমাটি নির্মাণ করেন ঋত্বিক ঘটক। সেখানে দেখা যায় নায়ক বিমলের কাছে তার পুরনো লঝঝরে ফোর্ড গাড়িটা কখনও মনে হয় মায়ের মতো, কখনো সে হয়ে ওঠে তার ঘরণী। শেষ পর্যন্ত প্রাণপ্রিয় ফোর্ড গাড়িটিকে অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয় বিমল। বিমলের সংবেদনশীল মনে শরীরী সত্তা নিয়ে থাকা এতদিনের ফোর্ড গাড়িটি শেষ পর্যন্ত এক ট্রাজিক যন্ত্রণা বয়ে আনে। যানকে কেন্দ্র করে এমন ট্রাজিক বেদনা তথা বিপন্নতার কথা বাংলা ছায়াছবিতে খুব বেশী নেই।।

বলা হয়, জাহাজে করে শিকাগো যেতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো জাহাজে বসে লেখা স্বামীজীর চিঠিগুলি আজও বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' কিম্বা 'জাপানযাত্রীর ডায়েরী'-র মূল্যাংশও এদিক থেকে কিছু কম নয়। স্বভাবসুলভ আবেগে সকল জান্তবতা অথবা যান্ত্রিকতাকে ভেঙে দিয়েও বাঙালি আজও তার হৃদয়ে লালিত করে চলেছে একটি পরিবহন-সত্তা অথবা যান-সত্তা! পুরনো ফোর্ড থেকে আধুনিক 'জেন'-বাঙালির মর্মে মর্মে, দুঃখে-আনন্দে কখনও পিতৃসত্তায়, কখনও বন্ধুসত্তায় আবার কখনো বা জীবিকা অথবা জীবনের বৃহত্তর প্রশ্নে, আবেগায়িত অনুষঙ্গে মিশে গেছে এই যান। আজও আমরা রেল-গাড়ীর কথা বললেই নস্ট্যালজিয়ায় খুঁজে পাই বিভুতিভূষণ কিম্বা সত্যজিৎকে আর ট্রামের কথা উঠলেই টনটন করে ওঠা বুকের কোণটির তরঙ্গে তরঙ্গে অজান্তে ভেসে ওঠেন কবি জীবনানন্দ। 'অযান্ত্রিক'এর সুবোধ ঘোষ কিম্বা ফিল্মের ঋত্বিক যেমন আজও হননি পুরোনো, তেমনি আমাদের অর্থাৎ বাঙালির স্মৃতিতে এক বিন্দু পুরনো হয়নি পালকির গান, বাইচের গান থেকে শুরু করে দেশ ছেড়ে আসা রেলগাড়ীর ক্রমবিলীয়মান ধোঁয়ার সাথে মিলিয়ে যাওয়া দেশভাগের যন্ত্রণা! যে জানে লবেজান হন শিব্রাম, যে যানকে (উড়োজাহাজ) দানবপক্ষী বলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যে যান 'পথের কাঁটা' হয়ে বিব্রত করে শরদিন্দুর ব্যোমকেশকে অথবা যে যান অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে হয়ে যায় কোনো এক 'অলৌকিক জলযান' সে যান বাঙালির সর্বকালের সম্পদ, তা তার স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে ও অধ্যাত্মের সংস্কৃতিতে তাই আজও বাঙালি তার নব নব রূপ ও রসের অনুসন্ধান করে চলেছে।

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯২
২. জীবনানন্দ দাসের কাব্যসমগ্র, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, ভারবি, কলকাতা, ২০০৪
৩. অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭৩
৪. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ্ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫
৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০০১
৬. আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৮
৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড.দেবেশ কুমার আচার্য্, আধুনিক যুগ (১৯৫০-২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, আগষ্ট ২০১০
৮. পালকি থেকে পাতালরেল, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়